সুন্দর তব অঙ্গনখানি

প্রবন্ধ সংকলন

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ইউরোপের ভিতর ও বাহিরে	১৫
ইনকা সভ্যতার ধূসর প্রান্তরে— পেরুর পথে	৩১
একান্তে বিদেশ ভ্রমণ— দূরদেশী-প্রতিবেশী	৩৮
অন্ধকারের অবসানে— কালাহাণ্ডি	৪৮
কোরাপুটের পর্বতমালা ডিঙিয়ে— উড়িষ্যার জয়পুরে	৫০
কী খাব, কেন খাব	৫৫
ভাইরাস থেকে ভাইরাল	৫৯
সচরাচর সংক্রামিত ভাইরাস— হারপিস	৬৬
ডেঙ্গি থেকে বাঁচতে, মশার কামড় এড়াতে	৬৯
তরকা বা এপিলেপসি	৭২
প্রকৃতি ও মানুষ রক্ষার স্বার্থে	৭৪
মিড-ডে মিল অতীতে	৮১
মিড-ডে মিল বর্তমানে	৮৬
কিছু অভিজ্ঞতা কিছু কথা	৯০
হার না-মানা তিন কন্যা	৯৪
ঐক্যবদ্ধ নারী আত্মশক্তির জন্ম	৯৯
একটাই পৃথিবী	১০২

ভূমিকা

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক। ভাবনায় ও কাজে সমাজকর্মী। নিছক কর্মী নন, ভাবুকও। এই বইয়ের লেখাগুলিতে মিলে মিশে গেছে সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা ও কাজ।

এই বইটার একটা বড়ো বিষয় 'দেখা'। সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় প্রথমে দেখেছেন, অনেক জায়গায়, অনেক বিষয় দেখেছেন। দেখাকে শুধু দেখায় থামিয়ে রাখেননি, দেখে নিয়ে আমাদেরকে জানানোয় শেষ করেননি, আমাদেরকে বুঝিয়েছেনও। বুঝিয়েছেন রাষ্ট্রের কি করার কথা ছিল, রাষ্ট্র কি করেনি। এবং অতএব রাষ্ট্র কি ভয়ংকর অন্যায় করছে। এই অব্দি হলেও হতো। তারপর দেখিয়ে দিয়েছেন, মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের কি দেখার কথা, করার কথা এবং আমরা কি করছি না। লেখার বিষয় বিস্তারিত। দেশ বেড়াতে, দেখতে, জানতে, বুঝতে, যাওয়া, বাইরের দেশ, আমাদের দেশ। খাবার। স্বাস্থ্য, অসুখ, চিকিৎসা, মিড ডে মিল। জনস্বাস্থ্য, শৌচাগার, পরিবেশ। নারী। শিক্ষা। এ সব বড়ো বিষয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছেন গ্রামের লোকজন, আদিবাসী, দরিদ্র মানুষ, শিশু। অশিক্ষা, অনাহার, দারিদ্র। অবহেলা দুর্নীতি।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় নিছক বলে গেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন, লিখে দিয়ে কাজ শেষ করেছেন এমনটি নয়। একটা বিষয়কে সামনে এনেছেন। একটা সমস্যা, সমস্যা সমাধানে একজনের উদ্যোগ নেওয়া, একজনের উদ্যোগ গণউদ্যোগে পৌঁছে যাওয়া এমন কাজটি দেখিয়ে দিয়েছেন। আড়ালে বলতে চেয়েছেন আমরা সবাই চাইলে এমনটি করতে পারি। কিন্তু করি না। কোথাও যেন একটা অপরাধবোধ জন্ম নেয়। সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় চেয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু এমনটা হয়েছে। তো বেশ হয়েছে। একটা লেখা, একটা বই শুধুই পড়বো, এটাই বা কেমন কথা।

লেখার এই সামগ্রিক কাঠামো এবার লেখা ধরে ধরে কয়েকটি কথা বলি। বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে কয়েকটি লেখা আছে। একটি ইউরোপর বিভিন্ন দেশে যাওয়া নিয়ে। অন্যগুলি পেরু, আফ্রিকা ও চীনে যাওয়া নিয়ে। লেখাগুলি নিছক কি দেখলাম তা নিয়ে নয়। একটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, শিল্পকলা, মানুষজন, রাজনীতি, ভূগোল,

সহযাত্রী সবকিছু নিয়েই আলোচনা রয়েছে। এবং দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বিষয়ের সঙ্গে কিভাবে আরেকটি বিষয় জড়িয়ে থাকে। যা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, যারা ভ্রমণে যান, ভ্রমণ পত্রিকায় লেখেন এবং সেই লেখা পড়েন তাদের। সেইদিক থেকে এই লেখাগুলি ভিন্ন ধরনের।

দেশের ভিতরে বেড়াতে যাওয়া নয়, লেখকের কাজে যাওয়া কালাহান্ডিতে। কালাহান্ডির কথা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে আসে দারিদ্রতার কারণে। লেখক সেই দারিদ্রতার নিদর্শণ দিয়েছেন, কারণ খুঁজেছেন, সরকারি অবহেলা, ব্যর্থতার কথা ধরিয়ে দিয়েছেন।

লেখক নিজে চিকিৎসক। ফলে প্রত্যাশা থাকে তাঁর রচনা সংকলনে অসুখ নিয়ে লেখা থাকবে। অসুখ বিষয়ে লেখা আছে চারটি। একটি লেখা সাধারণ পাঠকের জন্য খুবই দরকারি। খাওয়ার সাথে, বেঠিক খাওয়ার সাথে অসুখের সম্পর্ক। 'ভাইরাস' নিয়ে লেখা রয়েছে। মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপত্রে ভাইরাস বিষয়ে খবর বেরোয়, ছোটোখাটো লেখাপত্তরও বটে। কিন্তু কৌতুহল মেটে না। চিকিৎসক লেখক আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। অসুখ বিষয়ে জানা বোঝা থাকলে সুবিধা হয়, কি করবো না, কি করবো, এগুলি জীবনযাত্রায় নিয়ে আসা যায়, সাবধান হওয়া যায়। প্রতিকারে যাওয়া যায়।

মিড-ডে মিল নিয়ে লেখা আছে দু'টি। এই বিষয়টি সমাজকর্মী লেখকের অত্যন্ত কাছের বিষয়। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে চলেছেন, ভেবেছেন, লিখেছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন। এই বিষয়টা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা জানি। শিশু ও শিশু-স্বাস্থ্য, শিশু পড়ুয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। অথচ একটা মিড-ডে মিল প্রকল্প ঠিকঠাক প্রয়োগ করলে তার প্রভাব কত সুদুর প্রসারী হয়ে পারে এবং ঠিকঠাক না করলেও তার প্রভাব কতটা ক্ষতিকারক আমরা বুঝিনা। চিকিৎসক ও সমাজকর্মী লেখকের এই অভিজ্ঞতা গভীর, নানা পরীক্ষাও করেছেন তিনি, প্রস্তাব দিয়েছেন, প্রয়োগ করেছেন। তা প্রকাশিত হয়েছে এই বিষয়ের লেখা দু'টিতে। আরও একটি কথা মিড-ডে -মিল প্রকাশ নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি শুধু মিড-ডে মিল পাওয়া বা না পাওয়া শিশুদের কথাই বলেননি। যারা এই মিড-ডে মিলের কর্মী, রাঁধুনী তাদের কথাও, তাদের সমস্যার কথাও এনেছেন। দেখিয়েছেন কর্তৃপক্ষের অবহেলা অনাসক্তি। সাম্প্রতিক কালে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনায় উঠে আসছে শৌচকর্মের ধরনের কথা। চিকিৎসক লেখক দেখিয়েছেন কি ভয়াবহ অবস্থা এই বিষয়ে অবহেলোর। সরকারি অবহেলার এবং তার ফলে কি সাংঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। এই শৌচকর্মের ধরন বদলের সাথে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বা পরিবেশ রক্ষার বিষয়। লেখকের লেখা থেকে পরিষ্কার যে বিষয়টিকে একটি গণ আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে গণ আন্দোলন বলতে বোঝায় রাজনৈতিক বিষয়,

মাঝে মাঝে সামাজিক বিষয়ে আন্দোলন। কিন্তু কখনই তা স্বাস্থ্য বিষয়ে নয়। অথচ এই শৌচাগারের দাবি ঘিরে একটি বড়ো রাজনৈতিক গণআন্দোলন হওয়ার দরকার। চিকিৎসক সমাজকর্মী লেখক সেই দিকে খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন।

লেখক সমাজকর্মের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, নানা ধরনের কাজে যুক্ত হন, নানারকমের মানুষের দেখা পান, তাদের কথা শোনেন, তাদের কাজ দেখেন, তাদের ভাবনার সাথে পরিচিত হন। এমনই সব মানুষদের কয়েকজনকে নিয়ে ছোটো খাটো কথা সাজিয়ে একটি লেখা রয়েছে। চমকে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতার গল্প।

সাধারণভাবে সাধারণ মানুষদের কথা থেকে লেখক বলে এসেছেন একটি বিশেষ বর্গে থাকা মানুষদের কথায়। সাধারণ নারীদের কথায়। একটি লেখায় তিনজন নারীর লড়াইয়ের গল্প। গল্পের মতো বাস্তবতার কথা। লড়াই করে, লড়াইতে জেতার এই সব গল্প অনেককে অনুপ্রাণিত করতে পারে এমনটাই বিশ্বাস।

তিনজন নারীর কথা থেকে নারীদের কথায় চলে এসেছেন লেখক তার পরের লেখাটিতে। কিভাবে নারীরা সংঘবদ্ধ হলে, সামাজিক কাজে নেমে পড়লে বদলে দিতে পারেন চারপাশ তার উদাহরণ লেখাটিতে। লেখাটি পড়লে মনে হয় এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, চাইলেই পারা যায়। অথচ সব জায়গাতে কেন এমন হয় না! এই ধরনের লেখা ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছলে নিশ্চয়ই আরও জায়গায় হবে এমনটি বিশ্বাস জন্মায় যারা লেখাটি পড়ছেন তাদের।

বইয়ের শেষ লেখা পরিবেশ নিয়ে। যা আজ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে যারা বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবছেন তাদেরই।

চিকিৎসক, সমাজকর্মী, ভাবুক, সংগঠক, লেখক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এই বইটির বিভিন্ন বিষয়ের লেখাগুলো পড়িয়ে চাইছেন আমরা তার সহযোগী হই।

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

লেখকের কথা

দেশ ভ্রমণ, নতুন নতুন সমাজ ও জীবন ধারার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন হওয়ার পথ বাধামুক্ত হয়। পেরুর বিমান বন্দরে এক কানাডিয়ান পাইলটের সঙ্গে আলাপে বিশ্ব সৌহার্দ্রের আবেদন পাই। যেখানে মানুষ, বর্ণ-জাতপাত, ধনি-দরিদ্রের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ ধুয়ে মুছে শুধু ভালোবাসার বন্ধনে মিলিত হবে।

এখনও আমরা অনেকেই ছোট্ট সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ে আছি। একদিকে দারিদ্র, অনাহার অন্যদিকে মুষ্টিমেয়র লোভ, লালসা ও হিংসা। ভেদাভেদিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে । আর ভালোবাসা, সৌহার্দ্য অন্ধকারে ডুবে আছে।

তাই বইয়ের প্রথমেই বিদেশ ভ্রমণের প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। সুস্বাস্থ্য মানুষকে দেয় আনন্দময় জীবন। ভেঙ্গে পড়া শরীর সার্বিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এতে মানসিক বন্ধ্যাত্বও আসে। সে কারণে রয়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ে কয়েকটি লেখা। মিড-ডে মিল একটি জাতীয় কর্মসূচি । বিদ্যালয়ে শিশুদের ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে এবং কিছুটা পুষ্টির প্রয়োজনে লেখা হয়েছে মিড-ডে মিল অতীতে ও বর্তমানে । আর তিনজন অন্তজ শ্রেণির মেয়ের হার না-মেনে তাদের জীবনের উত্থানের আত্মকাহিনী। শেষের প্রবন্ধ, নারী স্বাধীনতা এবং তাঁদের ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তি উন্মেষের ইতিকথা।

কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় শ্রী শুভেন্দু দাশগুপ্তকে। যিনি কখনও আমাকে ফিরিয়ে দেননি। এই বইয়ের ভূমিকা তাঁরই লেখা। আমার পূর্ববর্তী প্রকাশিত বইটিতে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন কিন্তু ছাপার ত্রুটিতে তাঁর নামটা উহ্য থেকে গেছে, সেজন্য আমি তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তাঁর মনে এরজন্য কোনও বিরূপ প্রভাব পড়েনি। অদ্ভুত এক ভালো মনের মানুষ— শুভেন্দুবাবু।

প্রচ্ছদে আমার ভাইপো, শ্রী সোমনাথ মুখার্জির মোবাইলে তোলা একটি ছবি নেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর প্রচ্ছদে ফটোসপের মাধ্যমে কাজ করে দিয়েছেন শ্রীমতী মধুমিতা দাশগুপ্ত। যে পরিমান সময় এই প্রচ্ছদ সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ব্যয় করেছেন তারজন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

শ্রী অমর্ত্য সেন প্রতিষ্ঠিত প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট-এর একজন অন্যতম কর্ণধার শ্রী কুমার রানা, তার সুচিন্তিত মত প্রচ্ছদের ব্লাবে ব্যক্ত করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বই-এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার অপরদিকে শ্রী সন্তোষ রানা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সম্প্রতি তাঁর লেখা 'রাজনীতির এক জীবন' বইটির জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। দীর্ঘকাল তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ের মর্যাদা বাড়াতে। কিছুদিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে ডা. অমিতাভ নন্দীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম, ম্যালেরিয়া নিয়ে আমার কয়েকটি লেখা দেখে দেওয়ার প্রয়োজনে। সে সময় তিনি তাঁর জ্ঞানের ভান্ডার আমার কাছে উজার করে দিয়েছিলেন। বহু বছর পর পুনরায় তাঁর কাছে আসতে হল আমার পরবর্তী বইয়ে তাঁর মন্তব্য লিখে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। এ ছাড়াও আর এক টি দরকারও ছিল। সম্প্রতি আমার আফ্রিকা যাওয়ার কথা। ওখানে শুনেছি মশা বাহিত রোগের খুবই দাপট। সে সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিতে যাতে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরতে পারি। তিনি খুবই মনোযোগ দিয়ে আমার লেখাগুলি পড়েছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানে বানান সংশোধন ও পাঠকদের সুবিধার্থে সামান্য কিছু পরিমার্জন করে দিয়েছেন। ট্রপিক্যাল রোগ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

ডা. গৌর মন্ডলের সঙ্গে আমার দীর্ঘ ৫০ বছরের বন্ধুত্ব। আমার লেখাগুলিকে সমৃদ্ধ করতে গৌর সবসময়ই আমার পাশে থেকেছে। যখনই ওর সঙ্গে কথা হয়েছে প্রত্যেকবারই সে নিত্যনতুন জ্ঞানের সঞ্চার করেছে আমার মধ্যে। কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বকে ম্লান করতে চাই না। আমার আন্তরিক ভালোবাসা রইল ও এবং ওর পরিবারের প্রতি।

এ ছাড়াও আছে আমার বন্ধুবর্গ যারা আমার পাণ্ডুলিপি দেখে সুপরামর্শ দিয়েছেন লেখাগুলির উৎকর্ষের জন্য। আমার স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধু, ভাই-বোনেরা ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে তাতে আমি লেখার প্রেরণা পেয়েছি।

অবশেষে যিনি আমার বইটি প্রকাশিত করে বইটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন শ্রী সন্দীপ নায়ক। আমার পূর্বের বইগুলির প্রকাশকও তিনি।

এই বইয়ের প্রবন্ধ সমূহ পাঠকের মননে সারা জাগাতে পারবে কিনা তাতে সংশয় আছে। জীবন তরীতে ভেসে ওপারে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে তাই পাঠককূলের কাছে এটাই হয়তো আমার শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

ইউরোপের ভিতর ও বাহিরে
একজন ভারতীয় পর্যটকের চোখে

জীবন-জীবিকার ভারে ভ্রমণের নেশা কোনোদিন পেয়ে বসেনি আমাকে। পিতার কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এরপর বিলেত যাত্রা উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়। ওখানে থাকাকালীন পেশার সুবিধে নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার বেশ কিছু দেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতির বৈচিত্রময় রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

দেশে ফিরে আসার পর কয়েক দশক কেটে গেছে। একদিন আমার এক বন্ধু হঠাৎই অনুরোধ করে কেনিয়া ভ্রমণের জন্য তাঁকে সঙ্গ দিতে। রাজি হয়েছিলাম কোনোরকম উত্তেজনা অনুভব না করেই। এরপর আফ্রিকার সাবানা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে উদাসভাবে ভেবেছিলাম, এখান থেকেই দু'লক্ষ বছর আগে আমাদের আদি পূর্ব পুরুষেরা দু'পায়ে পথ চলা শুরু করেছিল। অদ্ভুত এক স্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলাম।

এরপর ভ্রমণের নেশা আমায় কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে। ছুটে চললাম পেরুর অ্যান্ডিসের পর্বতের চূড়ায় ইনকা সভ্যতার মাচু পিচু-তে এবং আমাজনের নদী বেয়ে তারই গভীর জঙ্গলে। কখনও মিশরের নীল নদে পাল তোলা নৌকো, ফেলুকা-য় চড়ে ভেসে গিয়েছি সুদূর অতীতে, থিবস মহানগরীর ফারাও-দের রাজত্বকালে। আবার বেরিয়ে পড়েছি জরডনের নীল গিরিখাতের পেত্রাতে এবং যেখানে আজ থেকে দু'হাজারের বেশি আগে ফ্যাবিটিয়ানরা অপরূপ প্রাসাদ গড়েছিল। আজও প্রাসাদের কারুকার্য দেখতে পর্যটকেরা ছুটে আসছে। অবশেষে মৃত্যুসাগরে ভেলার মতো ভেসে দেশে ফিরে এসেছি।

এরই মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ইউরোপে। জার্মানী এক হয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপ মিলিতভাবে গঠিত হয়েছে 'সেনজেন' অঞ্চল। আর এখানকার দেশেই চালু হয়ে গিয়েছে একক মুদ্রা ইউরো। ইনফরমেশন টেকনোলজির দৌলতে ইন্টারনেটের ইথারে কম্পিউটার পৌঁছে গেছে হাতের তালু থেকে পৃথিবীর সর্বত্র। ৩০০ কিলোমিটার ঘন্টার বেগের দ্রুতগামী ট্রেন ইউরোপের দেশগুলিকে আরও কাছাকাছি এনেছে। এছাড়াও দূরগামী ট্রেনে বা বাসে যাতায়াতের সময় দেখা যাবে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের জন্য অগণিত উইন্ড মিলের পাখাগুলি অবিরাম ঘুরে চলেছে।

তাই নতুন করে কৌতূহলী মন নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। প্যারিস থেকে দ্রুতগামী ট্রেনে ৬-৭ ঘন্টায় ১০০০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছেছিলাম

বার্সেলোনায়। তখন রাত ১১টা। থাকার হোস্টেলটি বেশ দূরে না হওয়ায় হেঁটে যাওয়াই মনস্থির করেছিলাম। পথ চলতি লোকজনকে ইংরাজীতে ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে এগোচ্ছিলাম। কোথায়ও দেখেছি পরিবারের সবাই মিলে হেঁটে চলেছে। কখনও ছিল রাস্তা শুনশান। মনে কিছুটা ভয়ের উদ্রেক হয়নি তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ এরই মধ্যে অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছে। তবে কেউ এসে আমাকে বিরক্ত বা বিব্রত করেনি। বরং হোস্টেল খুঁজতে সাহায্যই করেছে— যেমন স্মার্ট ফোন থেকে জি.পি.এস-এর মাধ্যমে হোস্টেলের সঠিক জায়গাটি চিনিয়ে দিয়েছে।

হোস্টেলে পৌঁছে অভ্যর্থনার ছেলেটিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কোথাকার লোক? সে জানাল ইউক্রেনের গৃহযুদ্ধের সময় সে দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। পরদিন সকালে রান্নাঘরে জলখাবার সেরে বৈঠকখানায় এসে দেখি প্যারিসের ২৫-৩০ জন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সভা করছে। আমি ছবি তোলাতে একটি মেয়ে এসে জানতে চাইল— কেন আমি তাদের ছবি তোলায় আগ্রহী? উত্তরে জানালাম, ইউরোপের কিছু ইয়ুথ হোস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। কোথায়ও আমি কোনও গুরুগম্ভীর সভা হতে দেখিনি। বরং বিভিন্ন দেশের যুবক-যুবতীদের আড্ডায় মসগুল হতেই দেখেছি। আমার ট্রেন ধরার তাড়া ছিল। তাই কথা না বাড়িয়ে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় নেমে মনে হয়েছিল এই সভা হয়তো ভবিষ্যতে বড়ো কোনও ছাত্র বিক্ষোভের ইঙ্গিত।

বার্সেলোনা থেকে খুব কম সময়েই দ্রুতগামী ট্রেনে মাদ্রিদে এসে পৌঁছলাম। এখানকার প্রধান রেলস্টেশনটি প্রাসাদের মতো। মাদ্রিদে স্বল্প সময়ের মধ্যে শহরের কয়েকটি নিদর্শনমূলক জায়গা দেখে চলে গিয়েছিলাম অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্পেনের পূর্বতন রাজধানী টলেডো-তে— মুসলিম, খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের বহুকালের মিলনভূমি। স্পেনের তাপমাত্রা জুন-[illegible]ই মাসে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরেই থাকে। সবারই বেশভূষা [illegible]শ ছোটো-[illegible]গ, মেয়েদের দেহ স্বল্পই আ[illegible]ত অর্থাৎ বেশিরভাগটাই খোলামেলা। ব্যাখ্যা অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন। কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। এমনকি [illegible] চাহনিতেও নয়। এসব পোশাকেই এরা পরে ও দেখে অভ্যস্ত। ছেলেমেয়ে থেকে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই সাবলীলভাবে হেঁটে চলেছে বা কোথায়ও বসে গল্পগুজবে ব্যস্ত।

মাদ্রিদ থেকে রাতের বাসে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে পথে রওনা হয়েছিলাম। লিসবন একটি ছোট্ট শহর আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে। অতীতের ঐতিহ্যের অঞ্চলে আধুনিক অট্টালিকার সংমিশ্রন সচেতনভাবেই ঘটানো হয়নি। ইউরোপের বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও পুরোনো শহরকে অতীতের গরিমায় রক্ষণ করা হয়েছে। লিসবনে একরাত থাকতে হয়েছিল। রাতে থাকার বাসস্থানে গিয়ে দেখি অভ্যর্থনার জায়গায় দু'জন নেপালী মেয়ে বসে আছে। এরা কাঠমাণ্ডু থেকে এসেছে। রাতে খেতে বেরিয়ে দেখি নেপালীদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, রেস্টুরেন্ট এবং আরও ছোটো ছোটো

দোকান। এদেরই একটি রেস্টুরেন্টে রাতের আহার সেরেছিলাম। এতো দূর দেশে কিসের খেই ধরে এখানে ওঁরা ঘর বাঁধল তা ভেবে অবাক হয়েছিলাম। পরদিন ভোরে ওদেরই একটি কফির দোকোনে কফি খেয়ে বেরিয়েছি— দেখি ফুটপাতে একজন গৃহহীন দু'টি কুকুর নিয়ে পথচারীদের দয়া পেতে ফুটপাথে বসেছে। অবাক হয়েছিলাম কুকুর দু'টিকে দেখে, অবিকল আমাদের দেশের নেড়ি কুকুরের মতো। মেট্রোতে এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকজন নেপালীকে দেখেছি কাজে যেতে। এখানে নেপালীদের একটি সংঘ আছে। যারা নিয়মিত ২০১২ সাল থেকে নেপালী ভাষায় পত্রিকা বের করে।

লিসবন থেকে আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থান— বুডাপেস্ট, প্রাগ ও ওয়ারশ। বুডাপেস্টে রাতে পৌঁছে ভুল বাসে উঠে বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম। অবশেষে বিভিন্নজনকে পথে জিজ্ঞেস করে নির্ভয়েই বাসস্থানে পৌঁছেছিলাম। তখন রাত ১২টা বেজে গিয়েছে। হোস্টেলের অভ্যর্থনায় যে এগিয়ে এল সে আসলে কাজাকস্থানের বাসিন্দা। এখানে আট বছর ধরে আছে। বুডাপেস্টের মধ্য দিয়ে দানিউব নদী বয়ে চলেছে। ঋকবেদে 'দানা' মানে তরল বিন্দু আর আবেস্তাতে 'দানা'-র অর্থ নদী। বুডা ও পেস্ট দু'টি শহর নিয়েই বুডাপেস্টের নামকরণ । গথিক স্থাপত্যের গীর্জা, প্রাসাদ ও সৌধগুলি অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিখুঁতভাবে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপে ট্রামের প্রচলন খুবই বেশি সেকারণে দূষণ খুবই কম। পথঘাট সবই ভীষণভাবে পরিচ্ছন্ন। কীভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে তা ভেবে আশ্চর্য লাগে।

চেক গণতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ। অপূর্ব নগরী। তাই পর্যটকদের আসা বেড়েই চলেছে। এখানেও শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ভালটাভা নদী। যার উপরে অপূর্ব চার্লস ব্রিজ। এই সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে দেখা যায় নদীর একপারে অতীতের অপরূপ সৌধের দিগন্ত। প্রাগের মেট্রোতে কোনোধরনের টিকিট চেক করার ব্যবস্থা দেখিনি। এমনকী কোনও ইলেকট্রনিক প্রতিবন্দক পার হতে হয়নি। কোনও বাঁধা ছাড়াই মেট্রো ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম। বাকি সবদেশেই অন্যটা দেখতে অভ্যস্ত আমরা।

যে বিষয়টা আমার জানা ছিল না। ইউরোপের হোস্টেলের ডরমিটোরিতে ছেলেমেয়েদের একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা আছে। রাতে সব ছেলেমেয়েকে ছোটো পোষাক পড়ে শুতে যেতে দেখেছি। এতে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হয়নি। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ওদের কাছে এটাই স্বাভাবিক এভাবেই এরা বড়ো হচ্ছে। এসব হোস্টেলের ডরমিটোরিতে বিভিন্ন দেশের যুবক-যুবতীরা এসে ওঠে। যে কারণেই হোক— ভারত থেকে আসা কোনও যুবককে চোখে পড়েনি। বয়সের দিক থেকে আমি এখানে ব্যতিক্রম। হোস্টেলের ছেলে-মেয়েরা সন্ধ্যেবেলা বৈঠকখানায় ওয়াইন বা বিয়ার নিয়ে গল্প করতে বসে। সপ্তাহের কোনও একদিন হোস্টেলে রাতে পিৎজা পার্টি হয়। সবাই হাত লাগায় পিৎজা তৈরিতে। মদ খেয়ে কোনও মাতলামো নেই, নেই কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা বা বেলেল্লাপনা। সবই সীমার মধ্যে বাঁধা। তাই সুন্দর। জীবনে পথ চলার

তো শেষ নেই। আর জানার পিপাসাও মিটতে চায় না। তাই আবার পা বাড়ালাম ইউরোপের পথে।

অশান্ত গ্রীস। উত্তাল মিছিলের পদধ্বনি। হরতালের নিস্তব্ধতা। বিশ্বে প্রচারের শিরোনামে গ্রীস। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শহর ও প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। এখানে মহাকবি হোমারের কল্পনায় রচিত হয়েছিল গ্রীসের মহাকাব্য— ওডেসি ও ইলিয়ড। দার্শনিক সক্রেটিস, প্লাটো ও আরিস্টটোল-এর জন্মভূমি। বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অলিম্পিক ও ম্যারাথনের সূচনাস্থল। গণতন্ত্রের উদ্ভব ও গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে গ্রীস ও রোম প্রাধান্য পায় বেশি। তবে জেনে রাখা ভালো খৃষ্টজন্মের ৬০০ বছর আগে বৈশালীতে, রাজা, প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স-এর বিমান বন্দরে যখন এসে নামলাম তখন বিকেল ৭টা। ইউরোপে গরমকালে সন্ধ্যা হতে হতে রাত নটা-দশটা বেজে যায়। আসার আগের দিন চব্বিশ ঘন্টা হরতাল ছিল। তাই যানবাহন বিশেষ চলছিল না। বিমান বন্দর থেকে শহরের কেন্দ্রে যাওয়ার গণ যানবাহন বন্ধ। অগত্যা ট্যাক্সি ভরসা। হাই-ওয়ে দিয়ে দ্রুত গতিতে ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে হঠাৎ নজরে এল বিশাল আকারের একটি বিজ্ঞাপন। যার অর্ধেকটিতে লেখা 'পর্যটকেরা স্বাগতম আর বাকি অর্ধেকে লেখা— 'উদ্বাস্তুরা দূর হটো'। সিরিয়া যুদ্ধের পর বহু সিরিয়াবাসী উদ্বাস্তু হয়ে গ্রীসে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকে গ্রীসে সাময়িক আশ্রয় নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। সিরিয়ার মানুষ সখ করে এখানে আসেনি। দেশ ছেড়ে এদের উদ্বাস্তু হতে হবে এ কল্পনাও তারা কোনোদিন করেনি। আমেরিকা ও মৌলবাদী মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা দেশটাকে ছাড়খার করে দিয়েছে।

ট্যাক্সিতে যাওয়ার পথে চালক বলছিলেন এখানে বেকারত্ব বাড়ছে। নিত্য ব্যবহৃত জিনিষের দাম আকাশছোঁয়া। যাদের কাজ আছে তারা বাজারের দামের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। ক্ষোভের কথাই বার বার ফুটে উঠছিল ওনার কথায়। অবশেষে রাত নটা নাগাদ হোস্টেলে এসে পৌঁছলাম। ডরমিটরিতে কম পয়সায় একটা শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার ঘরে আর একজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন, উনি আমেরিকার অধিবাসী। বর্তমানে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে থাকেন। উনি এক সময় শিক্ষকতা করতেন। স্বামী ছিলেন ডাক্তার। তবে অনেক বছর হল ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। ওনার তিন মেয়ে। উনি মেয়েদের বলেছেন নিজের মতো করে আনন্দে জীবন উপভোগ করতে। মেয়েরা কি করে জিজ্ঞেস করাতে জানালেন, বড়ো মেয়ে আমেরিকায় বনদপ্তরে কাজ করে। মেজ মেয়ে মরোক্কোর একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আর ছোটো মেয়ে কলেজে পড়ায়। জিজ্ঞেস করলাম ওরা সবাই কী বিবাহিতা? জানালেন বড়ো দু'জন বিয়ে করেছে তবে ছোটো মেয়ে লেসবিয়ান, কথাটা নিঃসংকোচেই বললেন। যাই হোক আরও কিছুক্ষণ ওনার সঙ্গে গল্প করার পর শুভরাত্রি জানিয়ে শুয়ে পরলাম। পরদিন সকালে রিসেপসনিস্ট ছেলেটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বাবা-মার সঙ্গে থাকে। কলেজ থেকে পাশ করে কোনও

ভালো চাকরি পায়নি। তাই অল্প মাইনেতে এই কাজটি করছে। কফি খেয়ে শহরটা বেড়াতে বেরোলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর। রাস্তাঘাট-ফুটপাথ সুন্দরভাবে বাঁধানো। শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদেশী পর্যটকেরা। বেশিরভাগ পর্যটক চলেছেন পাহাড়ের ওপরে পারথেনন-এর সৌধ দেখতে। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে এই ধর্মীয় সৌধটি নির্মিত হয়েছিল।

গ্রীক সভ্যতার আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে তুরস্কের অন্যতম শহর ইস্তানবুলে-এ এসে পৌঁছলাম। বেশ রাত হয়ে গেছে তাই সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়তে হল। সকালেই জলখাবার সেরে শহরের পথে বের হলাম। ইস্তানবুল শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে বসপরাস নদী। ইস্তানবুল, ইয়োরোপ ও এশিয়ার সংযোগ স্থল। এই দুই মহাদেশের মিলনক্ষত্র। ইস্তানবুলকে বলা হয় ইউরোপের রাজধানী। ইউনেসকো এই শহরটি পৃথিবীর ঐতিহ্যশালী শহর বলে ভূষিত করেছে। তাই ইস্তানবুল পৃথিবীর অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র। বছরে প্রায় এক কোটির বেশি পর্যটক ইস্তানবুলে আসে। এখানকার বেশির ভাগ অধিবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এখানে বোরখার প্রচলন চোখে পড়েনি। বিভিন্ন মসজিদের মধ্যেকার কারুকার্য অভূতপূর্ব। গ্রীক, রোম ও মিশর সভ্যতার স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে এই ইস্তানবুলে।

এখান থেকে রাতের ট্রেনে রওনা হলাম বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া-র পথে। ইনটারনেট থেকে একজনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। সকালে সোফিয়ার ট্রেন-স্টেশনে পৌঁছনোর পর গৃহকর্তীকে ফোন করি। অল্পক্ষণের মধ্যে উনি এসে আমাকে ওনার গাড়িতে বাড়িতে নিয়ে এলেন। বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় আছে পূর্ব ইউরোপের খুবই মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় সব পূর্ব ইউরোপের দেশের পরিকাঠামো খুবই উন্নত। পশ্চিমীদেশের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। আমার গৃহকর্তী একজন পদার্থ বিজ্ঞানী। উনি একাই থাকেন। বহুবছর আগেই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সন্ধ্যের সময় দু'জনে খাওয়ার সময় কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন এখানকার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। যুবকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে পশ্চিম দুনিয়ায়, বেশি রোজগারের আশায়। রোজগারের কিছুটা অংশ পাঠায় বাবা-মার জন্য। উনি এভাবে পেয়িং গেস্ট রেখে কিছুটা বেশি রোজগার করার চেষ্টা করেন। গল্প করতে করতে অকারণেই একটা কথা জিজ্ঞেস করে ফেললাম— বললাম এখানে ধর্ষণ হয়? উনি ইংরাজী শব্দের 'রেপ' কথাটা বুঝতে না পেরে ইনটারনেট থেকে ওনাদের ভাষায় শব্দটার মানে বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা ঠাহর করতে পারলেন না অর্থাৎ এসব দেশে এধরনের ঘটনা ঘটেই না। অথচ আমাদের দেশে দৈনন্দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবর।

অবশেষে সোফিয়া ছেড়ে চলে এলাম আলবেনিয়ার রাজধানী টিরানাতে। বর্তমানে আলবেনিয়া একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে ৫০-৬০ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ১০ শতাংশ খ্রীষ্টান। এখানে সবাই মিলেমিশে বাস করছে। টিরানা একঠি ছোট্ট শহর, খুবই ছিমছাম। তবে সমুদ্র সৈকত খুবই কাঁকুড়ে, বেড়াবার মতো বালুরাশি নেই। হোস্টেলে